স্মৃতিপট

টেরেজা—রোদ্দুরের এক নাম

পীযূষ ভট্টাচার্য

ডি. এস. আর. ১, উত্তর ২৪ পরগণা

কাপারনাউম গ্রামের জনৈক চিকিৎসক একটি শিশুকে দুরারোগ্য ঘোষণা করলেন। যীশুর পবিত্র ছোঁয়ায় ঐ শিশুর মুখে হাসি ফিরল। শিষ্য পিটারের শাশুড়ির প্রচণ্ড জ্বর। যীশু তাঁকেও সুস্থ করলেন। যীশুর এই সেবা-শক্তি দেখে রোম সম্রাট স্তম্ভিত, বিচলিত। মোজেস বলেছিলেন, "কেউ তোমার চোখ উপড়ে নিলে, তুমিও তার চোখ উপড়াও। কেউ তোমার দাঁত ভাঙলে, তুমিও তার দাঁত ভেঙো।" কিন্তু যীশু বললেন, 'কেউ তোমার ডান গালে চড় দিলে, তুমি তোমার বাঁ গাল পেতে দাও। শুধু মাত্র প্রেম দিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে জয় করো।" মানুষকে ভালোবাসার এই মহামন্ত্র অ্যাগনেস গোনসা বোজাসিউ পরবর্তীকালের মাদার টেরেজা যীশুর কাছে পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন— ঈশ্বর আমাদের পিতা। আমরা সকলে তাঁর সন্তান। সকলে পরস্পরের ভাইবোন। তাই আমাদের ভাইবোনদের হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতে হবে। মাদারের প্রার্থনার মন্ত্র—"Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand, Anyone may gather it, and no limit is set. Everyone can reach this love through meditation, spirit of prayer and sacrifice, by an intense inner life." এই সূত্রে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এসে পড়ে।—একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কি মানুষের উপকার করব, তাকে দয়া করব?" রামকৃষ্ণদেবের উত্তেজিত উত্তর ছিল—"তুই শালা দয়া করবার কে? শুধু জীবকে শিবজ্ঞানে পুজো করবি।"—এটাই বেদান্তেরও মূল কথা। যেখানে জীব ও শিব তথা ব্রহ্ম অভিন্ন। মাদার টেরেজা এই বাণীই লাভ করেছেন মহাপুরুষ যীশুর কাছে। তাঁর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত দিয়েই আমাদের এই বাণীই দিয়ে গেছেন—আর্তের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। তাঁর কথায় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন অসুখ কুষ্ঠ নয়, যক্ষা নয়। অপরের কাছে অবাঞ্ছিত হওয়াই সবচেয়ে বিভীষিকাময় অসুখ। সবাই তোমায় ত্যাগ করল। কেউ তোমার কথা ভাবল না, তোমার যত্ন করল না, তুমি নির্মমভাবে নিঃসঙ্গ হলে— এই হল সব থেকে বড় ব্যাধি। সবচেয়ে বড় কষ্ট হল— সেবা না পাওয়া, ভালোবাসা থেকে উৎখাত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল—শোষিত, দরিদ্র ও রোগক্লিষ্ট প্রতিবেশীর প্রতি চরম উদাসীন থাকা। এই ব্যাধি, এই কষ্ট আর এই অভিশাপের অন্ধকার থেকে আলো জ্বালাতেই যেন ঈশ্বরের দূত হয়ে এসেছিলেন মাদার টেরেজা। মানবিকতার রোদ্দুর হয়ে।

মাদার টেরেজা চাইতেন তাঁর জীবনী যেন না লেখা হয়। জীবনকালে যীশুর জীবনী লেখা হয়নি। তবুও তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তাঁর জীবনের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। মাদার সেই যীশুর কাজই করে গেছেন। সেটাই তাঁর জীবন, সে-ই তাঁর বাণী—"Christ Liveth in me." প্রচারবিমুখ এই মহিলাই লক্ষ লক্ষ আর্ত মানুষের মা। এই তাঁর আসল পরিচয়। সেই মোটা শাড়ী, নীল পাড়, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল। ছিঁড়ে গেলে নিজেই সারিয়ে নেন। তিনিই আবার হেঁটে গেলে, সেই ধূলি চুম্বন করতে হাজার মানুষ পাগল। ইনিই সেই প্রায় পরিচয়হীন বিশ্ববন্দিতা মহিলা, যাঁর জন্ম ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট। যুগোশ্লাভিয়ার অ্যালবেনিয়ায়। স্কোপয়ে গ্রামে। আসল নাম অ্যাগনেস গোনসা বোজাসিউ (Agnes Gonxha Bejaxhiu)। মা, বাবা ও তাঁদের তিন সন্তানের ছোট্ট পরিবার। বাবা নিকোলাস ছিলেন একটি ছোটো মুদি দোকানের মালিক। মা দ্রানাফিল ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও বাবা-মার হৃদয়ে ভক্তি ছিল, ছিল কর্তব্যনিষ্ঠা। পড়াশোনায় অ্যাগনেস ভালো ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। ছিলেন ধীরস্থির। বাড়ীতে ও স্কুলে যীশুর ছবিতে সশ্রদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বারো বছর বয়সেই একটি ধর্মসংস্থার সদস্যা হন। সংস্থাটির নাম 'সোডালিটি'। 'সোডালিস' শব্দটির অর্থ অকপট বন্ধু। সংস্থাটির প্রধান কাজ ছিল—সেবা ও বাণী প্রচার। অ্যাগনেস স্বপ্ন

দেখা শুরু করলেন যে মিশনারি হয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করবেন। তিনি বললেন—"I shall go out and give the love of Christ." ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর, যুগোশ্লাভিয়ার জেসুইটদের প্রথম দল কলকাতায় এল। উদ্দেশ্য যীশুর ভালোবাসার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পনেরো বছরের কিশোরী অ্যাগনেসের সেই যাত্রায় কলকাতায় আসার অনুমোদন মেলেনি। সেই পুরোহিত দলের এক সদস্য কলকাতা থেকে কার্শিয়াং পৌঁছান। তিনি স্থানীয় মানুষদের সুখদুঃখের সাথী হন। তাঁদের দারিদ্র-কষ্ট, বিপদ-আপদে সাহায্য করেন। 'সোডালিটি' সংস্থাকে লেখা তাঁর চিঠিতে ভারতবর্ষের একপ্রান্তের মানুষের দুঃখ-দারিদ্রের বিবরণ পৌঁছে যেত কিশোরী অ্যাগনেসের কাছে। উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপনাময় সেই চিঠিই অ্যাগনেসকে প্রেরণা জোগাত প্রবলভাবে। অবশেষে সেই সুযোগ এল আঠারো বছর বয়সে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ডাব্লিনের র‍্যাদ্‌ফার্নহামের লোরেটোতে সাময়িক শিক্ষানবিশীর পর তাঁকে পাঠানো হল কলকাতায়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে অ্যাগনেস জাহাজঘাট থেকে পৌঁছে গেলেন কলকাতার মিডলটন রো-তে অবস্থিত লোরেটো সিস্টারদের নানরিতে। সন্ন্যাসনী হওয়ার বাসনায়। সেদিন তাঁর পরনে ছিল কালো গাউন। গলায় ক্রস। মাথায় বাঁধা কালো রুমাল। হাতে কাঠের হাতল লাগানো একটি কালো ব্যাগ ও টিনের বাক্স। দার্জিলিংয়ে সেন্ট মেরিজ নভিশিয়েটে দু'বছর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন কলকাতায়।

স্কোপয়ে শহরের তরুণী অ্যাগনেস বোজাসিউ সন্ন্যাসিনী ব্রত গ্রহণ করে হলেন সিস্টার মেরি অ্যাগনেস। তাঁর এই নতুন জীবনে তিনি সেন্ট মেরিজ লোরেটো কনভেন্টের শিক্ষিকা নিযুক্ত হলেন। তাঁর বিষয় ছিল ভূগোল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার অ্যাগনেস এই স্কুলেরই অধ্যক্ষা নিযুক্ত হলেন। পেলেন ডটার্‌স অব সেন্ট অ্যান দলের নেত্রীর পদ। এইভাবে এন্টালির লোরেটো আর সেন্ট মিরিজ স্কুলের শিক্ষকতার কাজে কেটে গেল বেশ কিছু বছর। ইতিমধ্যে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সঙ্গে নিয়ে এল ভয়ানক মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ। ভাঙন। মানবতার অবমাননা। সিস্টার অ্যাগনেসের মনের মধ্যে এক পরিবর্তন শুরু হল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা তাঁকে যন্ত্রনাহত ক'রে তুলল। এন্টালির সেই স্কুলের অনতিদূরেই ছিল মতিঝিল বস্তি। বস্তির নিরন্ন, অভুক্ত মানুষদের দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল। বস্তির ৫২ বিঘা জলা জায়গার ওপরে বস্তিবাসীদের জীর্ণ আস্তানা, অনাহার অর্ধাহারে মানবতার চরম লাঞ্ছনা তিনি স্বচক্ষে দেখতে পারলেন না। ছাত্রীদের কাছ থেকে সপ্তাহে একদিনের টিফিন চেয়ে নিয়ে ছুটে যেতেন বস্তির মানুষদের কাছে। কখনও নিয়ে যেতেন ওষুধ, কখনও ছোটোদের জামাকাপড়। কিন্তু বুঝতে পারতেন স্কুলের গন্ডীর মধ্যে এই দুর্গতদের সঠিক সেবা সম্ভব নয়। ওদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হানাহানিতে বিধ্বস্ত শহর। যাবতীয় দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন ঘরছাড়ার। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বরে এল সেই দিন। যেটা তাঁর কথায় ছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন— the day of decission. এটাই ছিল সিস্টারের মাদার টেরেজায় রূপান্তরের প্রথম ধাপ। ক্যাথলিক অনুশাসন তাঁকে প্রথমে অনুমোদন না দিলেও ভ্যাটিকানের অনুমোদন পেলেন একটি বছর পর। নিজের সঠিক প্রস্তুতির জন্য রোগীর সেবার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিলেন পাটনার আমেরিকান মেডিক্যাল মিশনারি সিস্টার্স প্রতিষ্ঠানে। হলেন সিস্টার টেরেজা। গাউন ছেড়ে ধরলেন নীল পাড় সাদা শাড়ি। বাম কাঁধে ছোট্ট ক্রস। এই প্রথম খ্রিস্টান সিস্টারদের পোশাকে ভারতীয়তা। প্রথমে থাকতে হল একটি বৃদ্ধাবাসে—২নং লোয়ার সার্কুলার রোডের সেন্ট জোসেফ স্কুলের সিঁড়ির তলায়। পরে ১০ নং ক্রিক লেনের গোমস্ পরিবারের সঙ্গে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। আসবাব বলতে ছিল টিনের বাক্স, কাঠের হাতলওয়ালা কালো কাপড়ের একটা ব্যাগ, নুন রাখার পাত্র আর সামান্য বিছানা। তখনও মাটিতে শোওয়া অভ্যেস হয়নি বলে একটা লোহার খাট জোগাড় করে দিয়েছিলেন গৃহকর্তা।

এন্টালি স্কুলে মাদারের এক ছাত্রী ছিলেন সুভাষিণী দাস। শিক্ষিকার প্রেরণায় তিনিও ঘর ছেড়ে এলেন ক্রিক লেনে। মাদার তাঁর এই নতুন সহযোগীর নাম রাখলেন সিস্টার অ্যাগনেস। ক্রমে ক্রমে এই ১৪ নং বাড়ির তিন তলায় সিস্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। দু'বছরের মধ্যে তা দাঁড়াল ২৯য়ে। এরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পীড়িতদের সেবা করত। মতিঝিল বস্তির অভুক্ত মানুষেরা মাদারের জন্য অপেক্ষা করত। একদিনের ঘটনা—বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। 'নীলরতন সরকার' হাসপাতালের কাছে রাস্তায় এক মহিলা যন্ত্রণায় ছটপট করছে। পথচলিত মানুষেরা যথারীতি একবার তাকাচ্ছে আবার পরক্ষণে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। মাদার এগিয়ে গেলেন। নিজের পরিষ্কার ধবধবে সাদা গাড়ির ওপর নিজের কোলে ওই মহিলার নোংরা শরীর রাখলেন। মাথায় হাত বোলালেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সেবা করার সুযোগ হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলার মৃত্যু হল। সেদিন অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন মাদার। প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতেন। বস্তির অসুস্থ ও অভুক্ত মানুষের জন্য খাবার ও ওষুধ সংগ্রহ করে তাদের দিতেন। নিজের জন্য দু-একটি রুটি থাকত।

দিনের শেষে তা-ই খেয়ে নিজের খিদে মেটাতেন। জলে-কাদায় হুটোপাটি করা শিশুদের লেখাপড়া শেখানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা এঁদো পুকুরের পাশে দুর্গন্ধময় পরিবেশে তাঁকে নোংরা অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া জামা-কাপড়-পরা ছেলে মেয়েদের ক্লাস নিতে দেখেছিল তাঁর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রী। তারা প্রাথমিকভাবে কষ্ট পেয়েছিল তাদের অধ্যক্ষাকে ওই হীন-দরিদ্র-নোংরাদের মাঝে দেখে। কিন্তু অচিরেই তাদের শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বস্তিতেও সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৬। স্বেচ্ছায় কয়েকজন শিক্ষিকাও এগিয়ে এলেন। প্রয়োজন হল একটা স্থায়ী আবাসের। ১৪নং ক্রিক লেনে সেই আস্তানা হল। এখানেই শুরু হল মিশনারিজ অব চ্যারিটির কাজ। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ দিউস সিস্টার টেরেজাকে তাঁর পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমতি দেন। পোপ তাঁকে মাদার সম্বোধন করেন। সিস্টার টেরেজা হন মাদার টেরেজা। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর রোমের অনুমোদন লাভ করল মিশনারিজ অব চ্যারিটির নিয়মতন্ত্র। কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে বাড়ল সিস্টারদের সংখ্যা। ১৪ নং ক্রিক লেনের বাড়ি অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ল। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ৫৪-এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের নতুন বাড়িতে মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টাররা উঠে এলেন। সংস্থার সদর দপ্তর হল এই বাড়ি। এখান থেকেই মাদারের সেবার কাজ পরিচালিত হতে থাকল। এই দোতলা বাড়িটিই বর্তমানের মাদার হাউস—সারা বিশ্বের মাতৃতীর্থ।

মাদার এবং তার সিস্টাররা একসময় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের চোখে পড়ল, ফুটপাথে-রাস্তায় বহু নিরাশ্রয় মানুষ, যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে, অনাহার-অপুষ্ঠিতে ভুগছে। অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিন গুনছে। ফুটপাথে বেড়ে ওঠা, শোওয়া-বসা, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এই সকল ফুটপাথবাসীকে রিক্সায় বা ভ্যান গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন। মাদারের অনুরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি নিতেন। মাদার উপলব্ধি করলেন, মুমূর্ষু রোগীদের জন্য একটা পৃথক আবাস প্রয়োজন। সেই মতো কালীঘাট মন্দির লাগোয়া একটি পরিত্যক্ত যাত্রীনিবাস পছন্দ করা হল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখী নিঃসম্বল অসহায় মানুষদের সেবা করার জন্য এখানেই গড়ে তুললেন "নির্মল হৃদয়"। এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে মাদার টেরিজাকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেতে হয়েছে। তাই এটি তাঁর বড় আপন। এখানে মুমূর্ষু রোগীকে কারও সুপারিশে বা অনুরোধে-উপরোধে ঢুকতে হয় না। এখানে শত শত দুস্থ, বুভুক্ষু মানুষের ভিড়। যেন মৃত্যুমিছিল। অথচ কোথাও কোনও আর্তনাদ নেই। প্রসন্ন, শান্ত পরিবেশ। সিস্টাররা তাঁদের কাজ নীরবে করে চলেছেন। এ যেন দুর্গত, নিঃসহায় মানুষদের নরকের বিভীষিকা থেকে নন্দনলোকে উত্তরণ। যমদেব সমন পাঠিয়েছে। তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তবুও এদের মুখ প্রশান্তিতে ভরপুর। যেন মাদার তাদের অজান্তে শিখিয়ে যাচ্ছেন—তারা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর তাদের ডাক দিয়েছেন। তাই তারা নিঃশঙ্কভাবে সেই ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে চলেছেন। একবার একজন মুমূর্ষু মানুষ "নির্মল হৃদয়" এর দরজায় পড়ে আছে। খবর গেল মাদারের কাছে। মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে সযত্নে নিয়ে গেলেন। পোকাভর্তি গা নিজের হাতে ধুয়ে দিতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় মাদার তার সঙ্গে কথা বললেন। এতদিন সে পথের ধারে পড়ে ছিল। কেউ তার কোনও খবর রাখেনি। মিষ্টি কথা বলেনি। মানুষটি অবাক। মায়ের সেবায় সে যেন নতুন প্রাণ পেল। একবার ডয়েগ 'নির্মল হৃদয়" এ এসেছেন। একজন শীর্ণ বৃদ্ধা চোস্ত ইংরেজিতে ডয়েগের কাছে সিগারেট চেয়ে বসলেন। ডয়েগের সঙ্গীরা সকলেই ধূমপানে অভ্যস্ত কিন্তু সে সময় কারও কাছেই কোনও বিড়ি-সিগারেট ছিল না। ডয়েগকে অপ্রস্তুত করে বৃদ্ধা পরিচয় দিলেন, "আমি কুমারী মারে। এডিনবরায় নার্সিংয়ের শিক্ষা নিয়েছি। তবে সেই সব নাই-বা বললাম। এখানে আছি। যাবার জন্য দিন গুনছি। এখানে সবাই ভালো। সেবাযত্নের কোনও খামতি নেই। বিশেষ করে মাদার টেরেজা— তিনি মানুষ নন, দেবতা।" ডয়েগ লোক পাঠিয়ে সিগারেট আনালেন। বৃদ্ধার মুখের কাছে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা সম্পূর্ণ অন্ধ। ডয়েগ বিদায় নিলেন। বৃদ্ধা আবার কৃতজ্ঞ চিত্তে বলে উঠলেন, "মাদার টেরেজা মানুষ নন। তিনি দেবী।" ডয়েগের সঙ্গে এসেছেন একজন লর্ড বংশোদ্ভূত ইংরেজ। পরনে দামী পোশাক। দীর্ঘকায় অভিজাত চেহারা। মুমূর্ষুদের দেখছেন। তাঁর মুখখানা ভারি বিষন্ন। এত মানুষের কষ্ট তিনি সইতে পারছেন না। বাইরে তখন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বড় গাড়ি। গাড়িতে উঠতে উঠতে লর্ড বললেন, "এই দামী পোশাক পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।"

কুষ্ঠরোগীদের জন্য মাদারের ভাবনার শেষ ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় কুষ্ঠরোগীদের ভিক্ষা করতে দেখলে তাঁর মন কেঁদে উঠত। তিনি তাদের কাছে যেতেন, কথা বলতেন, আদর করতেন। ভারত ছেড়ে যাবার সময় মহামান্য পোপ ১৯৬৪ সালে তাঁর লিমুজিন গাড়িটি মাদারকে দান করেছিলেন। মাদার গাড়ি বিক্রির টাকা কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম ও চিকিৎসায় ব্যয়

করলেন। আসানসোলের কাছে পাওয়া সরকারী জমিতে গড়ে উঠল "শান্তিনগর"—যা কুষ্ঠরোগীদের শান্তির আশ্রয়। ১৯৭১ সালে মাদার 'পোপ জন শান্তি' পুরস্কার হিসেবে ২১হাজার ৫০০ ডলার পান। সেই অর্থও ব্যয় হয় কুষ্ঠরোগীদের জন্যই। অন্যদিকে টিটাগড়ে রেলকোম্পানির দেওয়া জমিতে মাদার যে কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম করেছিলেন তা বর্তমানে 'গান্ধী প্রেম নিবাস' নামে পরিচিত। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, ডায়াস গান্ধীজির জন্মদিনে আশ্রমটির শুভ উদ্‌বোধন করেন। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বহু তরুণ-তরুণী সেই আশ্রমের সুচিকিৎসায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। বস্তিতে বস্তিতে দরিদ্র মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি কুষ্ঠরোগীর সেবা করতেন। তাদের শরীরের ক্ষত নিজের হাতে ধুয়ে দিতেন। গান্ধীজির স্বহস্তে কুষ্ঠরোগীর সেবা হয়তো অনুপ্রেরণা জোগায় মাদারের মনে। মাদারের পরিচিত মিঃ জন ও তাঁর দাদা পিটার দুজনেই সুন্দর চেহারার স্বাস্থ্যবান যুবক। দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু মাদারের চেষ্টায় দু'জনেই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।

সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত মাদারের কাজ। ১৯৬১ সাল। দিল্লীতে তখন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ছিলেন মিঃ কুত্‌তাত। শিশুদের জন্য একটা আশ্রম তৈরী করতে তিনি মাদারকে সাহায্য করলেন। সেই রাষ্ট্রদূতের চেষ্টায় সুইজারল্যান্ড থেকে অর্থসাহায্য এল। মাদার দিল্লীর বুকে গড়ে তুললেন— শিশুভবন, যার উদ্‌বোধন করলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ১৯৬২ সাল। কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে মাদার তৎকালীন বোম্বেতে গেলেন। শুরুতে তাঁর কাজের অসুবিধা হল। শহরটা ঘুরে মাদার মন্তব্য করলেন—"বোম্বের বস্তিগুলো কলকাতার বস্তি থেকেও খারাপ।" যথারীতি বোম্বের মানুষরা মাদারের প্রতি অসন্তুষ্ঠ হল। কিন্তু কুইন্সরোডে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকা জনৈকা মহিলার দেহ বোম্বেবাসীকে সত্যিই লজ্জায় ফেলল। মাদার সেখানকার দুস্থ, মুমূর্ষুদের জন্য আশ্রম গড়ার তাগিদ অনুভব করলেন। অবশেষে ধর্মযাজক ও বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর তিনি বোম্বেতেও কলকাতার 'নির্মল হৃদয়'-এর মতো মুমূর্ষদের আশ্রয়স্থল স্থাপন করলেন। এবার ডাক পেলেন ভেনেজুয়লার ধর্মপালের কাছ থেকে। সেখানে মাদারের সেবাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। দীক্ষাপ্রাপ্ত ক্যাথলিকদের প্রায় অর্ধেক যে মহাদেশে বাস করেন, সেখানে মাদার পাঠালেন তাঁর সেরা সন্ন্যাসিনীদের। সেখানকার মেয়েরাও তাঁর সঙ্গে থাকলেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ভারতের বাইরে মাদারের প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। পরে ভেনেজুয়েলায় আরও দু'টি ও পেরুতেও একটি আশ্রম খোলা হয়। রোমে যাবার ডাকও পেলেন মাদার। মহামান্য পোপ নিজেই মাদারকে একটি আশ্রম খুলতে বলেছেন। মাদার ও সন্ন্যাসিনীরা উৎসাহিত হলেন। শুরু হল কাজ। রোমে প্রেম-প্রচারিকা সংঘের কাজ আরও জোরালো করে তোলার জন্য লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত ট্রেনিং সেন্টারকে রোমে সরিয়ে আনলেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এই ট্রেনিং সেন্টার। ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ধর্মপালের আমন্ত্রণে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায়। ধর্মপালের অনুরোধে তিনি সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করলেন। জনৈক ভদ্রলোক মিঃ জন জে. ম্যাকগীর সহযোগিতায় মাদার পাঁচজন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বুর্কে গেলেন। সেখানে মঠ স্থাপন করে কয়েকজন সন্ন্যাসিনীর উপর ভার দিয়ে এলেন। এইভাবে তাঁর সেবাকর্ম ছড়িয়ে দিলেন জর্ডনে, ইজরাইলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র গাজায়, ইয়েমেনে। সর্বত্র রয়েছে মাদার টেরেজার সেবাকেন্দ্র। নিউইয়র্কে, মেক্সিকোতে, দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং ১৯৭৬ সালে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত গুয়েতেমালার গৃহহারা নিঃস্ব মানুষদের দিকেও তার সেবামাখানো দয়ালু হাত বাড়িয়েছেন। ১৯৭৭ সালে ম্যানিলা এবং হাইতিতেও তাঁর সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। মাদারকে কেন্দ্র করে এসময় সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে বিরাট কর্মকাণ্ড। কর্মরত আছেন ২০০০ এর বেশী সেবাব্রতী সিস্টার এবং ৫০০র বেশী সেবাব্রতী ব্রাদার। ছাব্বিশ হাজারের বেশী মিশনারি ব্যস্ত রয়েছেন মাদারের কর্মসংস্থায়।

সেবাকর্মের স্বীকৃতির জন্য মাদার কখনও অপেক্ষা করতেন না। স্বীকৃতিসূচক পুরস্কারের চেয়ে পীড়িত ঠোঁটের একটুকরো হাসি মাদারের কাছে যীশুর আশীর্বাদের মতো। তা পেতেই তিনি জীবন পণ করেছিলেন। নিজের দেশ, নিজের মানুষ—সব কিছুকে তিনি হেলায় ত্যাগ করেছিলেন। সব রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দূরে সরিয়ে রেখে অসহায় মানুষদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শত কষ্টকে অনায়াস উপেক্ষা করে। তবু তাঁর স্বীকৃতিতে তাঁর অগণিত ভক্ত, শিষ্যদের গর্বিত হওয়ার কথা। ১৯৬২ সালে পেয়েছেন পদ্মশ্রী। সেই বছরেই সম্মানীয় ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ করলেন। এরপর ১৯৭১ সালে ভাটিকান সিটিতে পেলেন 'পোপ জন পিস' পুরস্কার। সেই বছরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেলেন 'গুড স্যামারিটন অ্যাওয়ার্ড' আর 'জন এফ কেনেডি' ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাওয়ার্ড। ওই একই বছর ক্যাথলিক

ইউনিভারসিটি অব আমেরিকার পক্ষ থেকে লাভ করলেন সম্মানসূচক উপাধি—ডক্টর অব হিউম্যান লেটারস। "জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার' লাভ করলেন ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে পেলেন 'টেমপেলটন পুরস্কার'। এই পুরস্কারের অর্থমূল্যে তিনি কুষ্ঠরোগীদের জন্য এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। ১৯৭৪ সালে পেলেন 'ম্যাটার এট ম্যাজিস্টা' পুরস্কার। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে আয়োজিত বিশ্বনারী সম্মেলনে মাদারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বিশ্বের এক মহিয়সী মহিলারূপে। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদারকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব্ ডিভিনিটি' উপাধি দেন। ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মাদারকে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭৯ সালে বিশ্বশান্তিতে পান 'নোবেল' পুরস্কার। ওই বছর এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকা। আর ১৯৮০ সালে পেলেন ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন'।

১৯৯৬ সালে শ্বাসযন্ত্র এবং হৃদ্‌যন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় মাদারকে চারবার নাসিংহোমে ভর্তি হতে হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ১৩ মার্চ অসুস্থতার কারণে মিশনারিজ অব্ চ্যারিটির পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান মাদার। মিশনারিজ অব্ চ্যারিটির সুপিরিয়র জেনারেল পদে নির্বাচিত হন সিস্টার নির্মলা। আর ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ৯টা ৩৫ মিনিটে রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাদার টেরেজা ইহলোক ত্যাগ করেন। সেবাকর্মে বিশ্বের শিখরতম মানুষের এই নক্ষত্রপতনে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষও শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

রোদ্দুরের মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয় না। এক অফুরান শক্তি রোদ হয়ে অনিমেষে পৌঁছে যায় পৃথিবীর জীর্ণ ঘর, অন্ধকারময় গলি। নরকের গভীরতম খাতও কেমন আলোকিত হয়, এমনই তার শক্তি। মানবিকতার অবমাননা, অশ্রদ্ধা, অসহায়কে উপেক্ষা যেন সভ্যতার কৃষ্ণগহ্বর, সভ্যতার সংকট। পীড়িতকে অবজ্ঞা করা, নিঃস্বকে উপহাস করা আর অসুস্থ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে বহু অর্থব্যয়ে তীর্থ ঘুরে ঈশ্বরের মিথ্যে অনুসন্ধান করা—সবই বর্তমানের কালো চলরেখা। অথচ যীশুর কাছে মাদারের প্রার্থনা—"হে প্রভু, আমি যেন প্রতিদিন রোগার্ত মানুষের মধ্যে তোমাকেই দেখতে পাই। তাকে সেবা করতে গিয়ে তোমাকেই সেবা করি। তুমি যখন কদর্য, কুৎসিত, রুগ্ন, যুক্তিবিহীন মানুষের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাক, আমি যেন তোমায় চিনতে পারি আর বলতে পারি, যীশু তুমি আমার প্রিয় রোগী। তোমার সেবা করা কত মধুর। হে আমার প্রিয় রোগী, তুমি আমার কত আপন, কারণ তুমিই তো যীশুর প্রতিনিধি। তোমার সেবা করা আমার পরম সুযোগ।" এ প্রসঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরের পাণ্ডা, হারানের কথা ধরা যাক। হারান মাদারের কত তীব্র বিরোধীতাই না করেছে। কিন্তু হারানের যক্ষা হওয়ার খবরে অন্যান্য পাণ্ডারা যখন তাকে নির্দয়ভাবে বের করে দিয়েছিল, তখন সেই হারানকে মাদার টেরেজা আশ্রয় দিয়েছিলেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুস্থ হয়ে হারান চোখের জল ফেলে বলেছিল—"ত্রিশ বছর কালীঘাটে মা কালীর সেবা করে এসেছি। আজ মাদার টেরেজার মধ্যে আমি মা কালীকে প্রত্যক্ষ করলাম।'—এই হল সেই রোদ্দুর, সেই দৈবশক্তি যা নিমেষে হারানের মনের অন্ধকারকে আলোয় রূপান্তরিত করে। ঠিক যেভাবে শ্রীচৈতন্যদেব "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না?" বলে জগাই-মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, তাদের মনের দ্বেষ-কালিমা নিরসন করে আলোর পথ দেখিয়েছেন। মাদার সেই রোদ্দুর ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা ভারতবর্ষে, সারা বিশ্বে—"Let us love one another as God loves each one of us and bring peace in our own heart, our home, our country and in the world."

‘তোমার পূজার ছলে’

বিশ্বরূপ গোস্বামী

এ. ডি. এস. আর., সালার

বিতর্ক আর জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনিই বারবার অতিক্রম করেন নিজেকে। তিনিই সেই তিনি, যিনি এলিটের আবার সাধারণের। প্রথার বিরুদ্ধে তিনি অসামান্য প্রতিরোধ—সচেতন ভাবেই বা খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি ‘মিথ্’—জীবিত কালেই। সমুদ্রের মত উত্তাল আর উদ্দাম তাঁর কণ্ঠস্বরে মাধুর্য, লাবণ্যের সঙ্গে মিশে আছে অনন্ত পৌরুষ। রবি’র গানের আকাশের অনন্ত ‘বিশু পাগলা’—শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস —‘জর্জদা’ যেন সুরের মহাকাশে তখনও একলা পাগলের মত আবিষ্ট হ’য়ে বয়ে চলেছেন। আর আমরা হৃদয় পেতে শুনতে পাই তিনি গেয়ে চলেছেন ঃ

“ তোমায় গান শোনাবো তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখ জাগানিয়া।।
.....”

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে দেবব্রত’র জন্ম ২২ আগস্ট, ১৯১১। দেবেন্দ্র কিশোর আর অবলা দেবীর দ্বিতীয় সন্তান ‘জর্জ’। তাঁর জন্মের পরই মা অবলা দেবী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা ও শিশু দু’জনেরই প্রয়োজন শুশ্রুষা। প্রয়োজন একজন দেখাশোনা, সেবা ইত্যাদি করার জন্য লোকের। কিন্তু কিশোরগঞ্জের হিন্দুসমাজ দেবব্রত’র পরিবারকে কার্যত একঘরে করে রেখেছে কারণ দেবব্রতর পরিবার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। তাই জন্মের পর দেবব্রতর দেখভাল করতেন এক মিশনারি নার্স। তিনিই দিয়েছিলেন ‘জর্জ’ নাম। যদিও কিশোরগঞ্জের মানুষ তাঁকে ‘খোকা’ নামেই ডাকতেন।

বাবা দেবেন্দ্র কিশোর ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম। নিয়ম ক’রে উপাসনা, সত্য পথে চলা, ন্যায়ের পথে চলা’র প্রার্থনা ছিল রোজকার অঙ্গীকার। ছোট থেকেই নিয়ম করে প্রার্থনা করার Compulsion দেবব্রত মন থেকে মানতে পারতেন না। মনে মনে ছিঁড়তে চাইতেন এই বাঁধন। তিনি যে ব্যতিক্রমেই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমেই পরিণত। ১৯২৭ সালে কিশোরগঞ্জ থেকে ম্যাট্রিক পাস করলেন। ভর্তি হতে হল ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজে। যদিও পরবর্তীতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাধান্য রাখতে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের অনুরোধে দেবেন্দ্রকিশোর দেবব্রতকে স্থানান্তরিত করলেন কলকাতার সিটি কলেজে। আর সতেরো বছরের এই ঘূর্ণি যুবক স্থান পেলেন কর্ণওয়াসিল স্ট্রীটের 'OXFORD MISSION HOSTEL' এ। সেই সময় তিনি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কনক দাস, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত এবং আরো অনেকের সান্নিধ্যে এলেন। এবং ব্রাহ্ম সমাজের যাঁরা মাথা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেবব্রতর যোগাযোগ ঘটতে থাকল। ব্রাহ্মমন্দিরে তিনি তাঁর মা’র কাছে শেখা ব্রাহ্মসংগীত গাইতে শুরু করলেন। সেখানেও তিনি অন্যস্রোত—বিপরীতেই চলেন। ব্রহ্মসমাজের প্রার্থনার অংশটুকু বাদ দিলে সেকালে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী সভ্যরা সাহেবী পোশাক ও আদব কায়দায় বিশ্বাস করতেন। জর্জ কিন্তু সেখানেও অন্য মেরুর মানুষ—পরিপাঠী হীন, ছন্নছাড়া, গ্রন্থিহীন। কাঠ বাঙাল ভাষ্যে সেখানেও মানে সেই সমাজেও কথা বলতেন। যেন সুন্দর ছকে বাঁধা পরিধির মধ্যে ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল উল্কা তিনি। ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের সেন্টিনারি হলে রবীন্দ্রনাথ এলেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বেদীতে ব’সে উপাসনা করছেন রবীন্দ্রনাথ—সেই পরম দৃশ্যের সাক্ষী হলেন আর এক বৈদিক বাউল—দেবব্রত। ১৯৩১ সালে বি. এ. পাশ ক’রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর নিয়ে। অর্থনীতিতে এম. এ. ‘জর্জ’ বিনা মাইনেতে ঢুকে পড়লেন হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে—সাধারণ কেরাণীর পদে এবং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ’র হিন্দুস্থান বিল্ডিং থেকেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯৭১ সালে। হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদানের পরপরই গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনা ঘটে। বেতারে গান গাইলেন। এবং সেই সম সময়ে বন্ধু সন্তোষ সেনগুপ্ত তাঁকে নিয়ে গেলেন 'সেনোলা' কোম্পানিতে। আলাপ করালেন কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। নজরুল তাঁকে দিয়ে রেকর্ড করালেন, 'মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধো বাধ'। সেই রেকর্ডটি যদিও প্রকাশ পায় নি। হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্সে কাজ করার সময়ই আলাপ হয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবীর ঠাকুরের সঙ্গে। সুবীর ঠাকুর মশাই, জর্জদা কে নিয়ে গেলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পাম এভিনিউ'র বাড়ী। দেবব্রত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাঁর কাছে বহু গান শুনেছি ও শিখেছি। আমার মনে আছে পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিয়ে তিনি নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতেন—ছাপানো স্বরলিপির সামান্য অদলবদল করে আমাদের শেখাতেন ও আমাদের মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের হার্মনি করা সুরে তিনি আমাদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে গাইয়েছেন।.....। রথীদা (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং চারুবাবু (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য) আমার গান অত্যধিক পছন্দ করতেন।' ১৯৪০ সালে হেম সোম এর সহযোগীতায় ও তত্ত্বাবধানে প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করলেন—শ্রীমতি কনক দাসের সঙ্গে ডুয়েট। 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' আর 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব' (P 11866)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে (১৯৩৯) তিনি বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কালচারাল ইনস্টিটিউটে তিনি স্বদেশি গানের শিল্পী। এরই মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলন কে অন্য রূপ দিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে—গণচেতনা কে উদ্বুদ্ধ করতে, গনজাগরণের লক্ষ্যে নানা শহরে, হাটে, গ্রামে, মঞ্চে, মাঠে চলছে দল বেঁধে নাটক—সংগীত পরিবেশন। তৈরী হ'ল 'ছায়া', 'শহীদের ডাক' নাটক। প্রধান গায়ক দেবব্রত। গণনাট্য আন্দোলনে তিনি যাঁদের সাহচর্য পেয়েছিলেন—তাঁরা হলেন— ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, বলরাজ সাহানী, পৃথ্বিরাজ কাপুর, পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সলিল চৌধুরি'র কথায় ও সুরে গাইলেন ঃ

"আমার প্রতিবাদের ভাষা, আমার প্রতিরোধের আগুন,
দ্বিগুন জ্বলে যেন, দ্বিগুন দারুন প্রতিশোধে,
করে চূর্ণ, ছিন্নভিন্ন, শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন,
আনে মুক্তির আলো আনে,
আনে লক্ষ শত প্রাণে,
.....
.....।।"

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অর্থাৎ IPTA'র হ'য়ে দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা ও সুরে রচিত হ'ল 'নবজীবনের গান' সিরিজ। সেই সব গান পরমানন্দে গাইছেন দেবব্রত। এরই মধ্যে এল দুর্ভিক্ষ, অভিশাপের মত নেমে এল দেশভাগ—যা দেবব্রতকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে 'কালিকা' সিনেমা হলে মঞ্চস্থ হল 'রক্তকরবী'—দু'দিন ব্যাপী ৬ ও ৭ অক্টোবর —'গীতবিতান' সঙ্গীত শিক্ষায়তনের উদ্যোগে। 'রক্তকরবী'তে বিশুপাগলের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। ১৯৫৩ , ও ১৯৫৫ সালে পর পর দু'বার চীনে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি পাঠালেন ভারত সরকার। সেই দলের সদস্য ছিলেন দেবব্রত। চীনে গিয়ে দেবব্রত গাইলেন ঃ 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' (রচনা —কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুর— সলিল চৌধুরি। সেদিন শ্রোতৃমণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন মাও সে তুং।

পরে অবশ্য গানটিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কে দিয়ে রেকর্ড করান শ্রী সলিল চৌধুরি। একই ঘটনা ঘটে 'যদি কিছু আমারে শুধাও' গানটি নিয়ে। এই গানটিও তিনিই প্রথম তোলেন—জনপ্রিয় করেন কিন্তু সলিল চৌধুরি মশাই এই গানটি রেকর্ড করান শ্যামল মিত্রকে দিয়ে। অবশ্য পরবর্তীতে PRIME MUSIC (GLX 100) থেকে ২০০১ সালে 'আধুনিক গানে জর্জ বিশ্বাস' নামে একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। সেখানে আমরা তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই 'যদি কিছু আমারে শুধাও'।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই—তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলেন—রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবে। দুরত্ব বাড়ল গণনাট্য সংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। চিরটাকালই তিনি নিজের স্রোতের বিরুদ্ধে নিজেই

নৌকা বেয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীত বৃত্তের ভিতরে থেকেও তিনি যেন অন্য এক বৃত্ত। তিনি নিজে বলেছেন, "আমি তো গান শিখিনি, তাই নিজের মত করে জন মনরঞ্জনের চেষ্টা করতাম। মনের মত গান বেছে নিয়ে গায়কীর ঢংয়ে রংচং লাগিয়ে গেয়ে বেড়াই। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল আমি অরাবিন্দ্রীক, অতিনাটকীয়, অর্কেস্ট্রার জগঝম্প ইত্যাদি।" এতো তাঁর নিজের কথা। তবে তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য শিল্পীর কয়েকটি মন্তব্য শুনি, কী কী বলেছেন তাঁরা জর্জ বিশ্বাসকে নিয়ে ঃ

আমিয়া ঠাকুর ঃ জর্জের গানের এত সমালোচনা হয়, কিন্তু আমার দারুন ফেভারিট আর্টিস্ট। কারণ ওর এক্সপ্রেসন অসাধারণ।

সরলা দেবী ঃ ভারতবর্ষে একটাই পুরুষ গায়গ—জর্জ।

সুচিত্রা মিত্র ঃ জর্জের গান উৎসারিত হত গভীর আবেগ থেকে। তাঁর গলায় 'তুমি রবে নীরবে', 'আমি চঞ্চল হে' আমাকে মুগ্ধ করে আজও।

সন্তোষ সেনগুপ্ত ঃ দেবব্রত বিশ্বাসের সে সময়কার কণ্ঠ বড় আশ্চর্য সম্পদ ছিল। আগেকার দিনে মহাবলীপুরমের সমুদ্রের মত উত্তাল উদ্দাম। একই কণ্ঠে এত মাধুর্য, এত ঔদার্যের ও গভীরতার যেন এক অভাবনীয় সমাবেশ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঃ প্রাণহীন রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উদ্ধার ক'রে দেবব্রতই প্রথম মাঠে ময়দানে নিয়ে এলেন, জনতাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তাতে ছিলেন নতুন ভঙ্গী, অভিব্যক্তি ও নতুন তাৎপর্য। রবীন্দ্রসংগীতকে যে এভাবে জনতার কাছে নিয়ে যাওয়া যায় তা আমরা জানতাম না।

এমনই জর্জদা— যখন মঞ্চে উঠতেন—গান গাইতে তখন গম্ভীর 'গলায় বলতেন—'অডিয়েন্স লাইট প্লিজ'। তিনি শিল্পী ও শ্রোতার সরাসরি সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দর্শকদের মুখ না দেখতে পেলে গান গাইতে পারতেন না। গৌরী আইয়ুব কে একটি চিঠিতে লিখলেন ঃ

> *'....মঞ্চে গান গাইবার ব্যাপারটা আমি সিরিয়াস ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। বোলারের ভূমিকা আমার, আমার গলার আওয়াজ আমার ball। শ্রোতাদের intellect ও emotion আমার সামনে স্টাম্পের মতো দাঁড়িয়ে। আমার গলার আওয়াজ modulation-এ ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমার শ্রোতাদের intellect ও emotion-এর স্টাম্পগুলি উল্টে দিয়ে আউট করতে চেষ্টা করতাম। ভাগ্য ভালা থাকলে wicket পেতাম; না হলে পেতাম না। মঞ্চে বসে গান গাইবার আরেকটি সুবিধা হল মাত্র হাজার বারশো শ্রোতার সামনে বসে তাদের সঙ্গে direct communication এর সুবিধে পাওয়া যায়। মঞ্চে গান গাইবার সময় আমি প্রেক্ষাগৃহের সব আলো জ্বেলে দিতে বলি যাতে আমার শ্রোতাদের মুখ আমি দেখতে পাই।'*

একজন সংবেদনশীল মানুষ—ব্যতিক্রমী মানুষের চলার পথটি সহজ হবে না সেটাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মসংগীত দিয়ে শুরু ক'রে —গণসংগীত এবং পরে রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি পৌঁছে দিলেন উচ্চ-জনপ্রিয়তার স্তরে—তাঁর উপস্থাপনা, উচ্চারণ ও অনন্য সাধারণ ধ্বনি সম্পাতের মধ্যে দিয়ে। শুরু হল অন্য এক পটভূমি। অনুভূতির বন্ধ দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ছে পর্যাপ্ত আকুতি। কান্না ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে পাথর বুক—সমুদ্র করছে জীবন তটরেখা। তিনি মেঘমন্দ্র স্বর নিক্ষেপে গাইছেন,

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশে ছেয়ে.
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।"

কীসের যেন যাদুস্পর্শে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আমরা হৃদয় পেতে শুনি ঃ

"এসেছে এসেছে, এই কথা বলে প্রাণ
'এসেছে এসেছে', উঠিতেছে এই গান
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।"

গ্রীষ্মের রুক্ষতম সন্ধ্যেতেও—অন্তর জুড়ে ঝরঝর ক'রে বৃষ্টি ঝরে—নিরন্তর। তাঁর 'ঢ়' এর উচ্চারণ 'আষাঢ়' এ

যেন আরও বৃষ্টি নামায়—আরও প্রবল করে।

১৯৬৪ সালে তিনি প্রথম ধাক্কা খেলেন। Hindusthan Recordsকে দেওয়া চারটে গানের মধ্যে দুটি গান অনুমোদন পেল না— বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কাছ থেকে। সেই চিঠিটির প্রতিলিপি ঃ

From : VISVA BHARATI MUSIC BOARD
5, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta-7

Ref : MB/332 *March 6,1964*

To : Messrs Hindusthan Musical Products Ltd
Calcutta-12

Dear Sirs,

This has reference to your letters No.Recg. NB dated February 3, 1964 and 20th and 12th January, 1964.

The recorded tapes of Rabindranath Tagore's Songs (vocal and instrumental) as stated below were heard and the comments made by the Examiner with regard to some specific cases have been noted against them. We have to request you to act in accordance with the suggestions made by the Examiner and to take particular care in future so that such irregularities do not recur in future.

Sj. Debabrata Biswas

HSB 7217- Sudhu Jaoa Asha— O.K. (take 1)

HSB 7218- Essechillo Tabu Aso Nai— should be re-taken, cannot be approved. Inspite of repeated requests to control and restrict uncalled for composed musical interludes, the same have been applied freely making the production awfully jarring and distorted.

HSB 7190-1- Megh Bollachey Jabo Jabo— awfully melodramatic voice productions. Echo-Chamber which seems to have been used have utterly spoiled the fine note combinations in the song. Cannot be approved.

HSB 7191 - Godhuli Gagane Meghe— O.K. (take 1)

Yours faithfully
Sd/-
Hony. Secretary

তাঁর নিজের বই 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' বই থেকে জানা যায়—এই বিতর্ক চলাকালীন হঠাৎ বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের একজন সদস্যা তিনি খ্যাতি সম্পন্না সঙ্গীত শিল্পী উপস্থিত হলেন ১৭৪ই , রাসবিহারী এভিনিউ এর বাড়িতে। সেই পরীক্ষক বললেন—"এসেছিলে তবু আসো নাই' গানটির 'চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে' এই কথাগুলির প্রথমে 'চন্' কথাটি স্বরলিপি অনুযায়ী হয়নি। তখন জর্জদা সেই শিল্পীকে এই অংশটি গেয়ে শোনাতে বলেন। শুনে জর্জদা বললেন যে তাঁর গাওয়াটাও স্বরলিপি অনুযায়ী হয়নি কারণ তিনি 'চন্' শব্দটি নিচের মধ্যম সুর থেকে চড়া কোমল গান্ধার পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন যাতে দুই মাত্রা লাগছে অথচ স্বরলিপিতে আছে শুধু একমাত্রায়। অবশ্য শান্তিদেব ঘোষ 'এসেছিলে তবু আসো নাই' গানের টেপটি শুনে বলেছিলেন 'এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে।'

দেবব্রত'র অনুরোধে শান্তিদেব ঘোষ তাঁর এই মন্তব্যটি কাগজে লিখলেন এবং স্বাক্ষর করে তারিখ দিলেন। এই

কাগজটি মিউজিক বোর্ডের কাছে পাঠানো হলে বোর্ড অনুমোদন দেয়। যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গানে শিল্পীর স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিলেন। সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেসনে কম-বেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে।

তিনি আবার বাধা পেলেন ১৯৬৯ সালে। বোর্ড Hindustan Musicals Products Ltd. কোম্পানিকে জানালেন যে তাঁরা দেবব্রত বিশ্বাসের দু'টি গান অনুমোদন করেন নি। সেই চিঠিটির প্রতিলিপি ঃ

July 25, 1969

Messrs Hindusthan Musical Products Ltd"

6/1, Akrur Dutta Lane

Calcutta-12

Ref : Tune approval of Rabindranath Tagore's songs

Dear sirs,

On the basis of the report received from the Examiner who heard the tune of the following songs sung by Sri Debabrata Biswas we give below our views on them:-

HSB 8445— Puspa Diya Maro Jare

'Excessive music accompaniment hampers the sentiment of the song'.

2.HSB 8472—Tomar Sesher Ganer

'The tempo of the song is too quick. Music accompaniment is too much and the song itself is not sung according to notation.'

The above two songs should be re-recorded after eliminating above delects and submitted to the Board for re-examination. The recorded tepe has already been sent back to you.

Yours faithfully,

Hony-Secretary

Visva-Bharati Music Board

আঘাত পেয়েও নীরব থাকলেন জর্জ। অবশ্য হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস লিমিটেডের নিরোদ ব্যানার্জীর বারংবার অনুরোধে তিনি একটি চিঠি কোম্পানিকে লিখলেন ঃ

Messrs Hindusthan Musical Products Ltd.

6/1, Akrur Dutta Lane

Calcutta-12

Ref : Your letter dated 4.8.69 enclosing a copy of a letter dated 25.7.69 from the Hony. Secretary, VISVA BHARATI MUSIC BOARD

Dear Sirs,

Mr. Nirode Banerjee of your company has been pressing me hard for my comments on the views of the Music Board regarding recording of two songs 'Pushpa Diye Maro Jare' and 'Tomar Shesher Ganer'. As a matter of fact, the points referred to by the Examiner of the Music Board, are absolutely subjective and as such, any comment is absolutely unnecessary. Formerly, in the matter of recording of Tagore songs, it was the function of the Music Board to check up whether